অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উচ্ছেদ

এ যেন গত জন্মের কথা। একটা কাজের জন্য তখন হন্যে হয়ে ঘুরছি। তখন মুকুল আমার আশাভরসা। যখনই বিপন্ন বোধ করেছি তার কাছে ছুটেছি। সেও চেষ্টা করছে। আমরা তখন এক কলেজে পড়ি, একসঙ্গে ঘুরি, দু-জনেরই দুটো ভাঙা সাইকেল সম্বল। মুকুল থাকে শহরে, আমি কলোনিতে। জঙ্গল সাফ করে মাটির ঘরবাড়ি, ভাইবোন মেলা, তখন আমরা ছিন্নমূল। মুকুলের দাদা পি ডব্লিউ ডি-র কোয়ার্টারে থাকেন, আফিসের ডেসপাঁচ ক্লার্ক তিনি। যদি কোনো কাজের সুযোগ করে দেন, যে কোনো কাজ, মুকুলের জামাইবাবু স্কুল ইনসপেক্টর, মুকুলের দিদিকে ছোড়দি ডাকি—সকলেরই এককথা আরে হয়ে যাবে, আমরা তো আছি। জামাইবাবু একদিন ডেকে বললেন, সারকুলার এলেই তুমি অ্যাপ্লাই করবে।

কাজের জন্য চেনাজানা যত মানুষজন আছে, তাদের কাছে যাই-মুকুল আমার সঙ্গে থাকে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়। বাড়িতে অর্ধাহার অনাহার, কী যে করি, নিরুপায় বাবার একটাই কথা—বিলু, কেউ কিছু বলল!

কিছু বলল মানে, আমার চাকরির কথা জানতে চান। বাবার দিকে তখন তাকানো যায় না, ক্লিষ্ট এবং উদাস মুখখানি আমি তার এখনও ভুলতে পারি না।

কলেজে যেতে হয় যাই, বেতন দিতে পারি না বলে যে কোনো সময় নাম কাটা যাবে, বাড়িতে থাকলে পিতাপুত্রের একটাই কাজ, জঙ্গল সাফ করা, এবং গাছপালা লাগানো একদিন সকালে মুকুলই খবর দিল, হাতিনগর প্রাইমারি স্কুলে স্পেশাল ক্যাডার

শিক্ষকের পদে আমার কাজ হয়েছে—আশি টাকা মাইনে—আশি টাকাই বাবার হাতে তুলে দিই এবং এ-ভাবেই জীবন শুরু, সে দিন আনন্দে চেনাজানা মানুষের কাছে খবর পৌঁছে দিতে বেশ রাত হয়ে গেছিল ফিরতে। দু-বেলা আহারের বন্দোবস্ত হয়ে গেলে মানুষের আর কী লাগে! মুকুল না থাকলে বোধহয় আমার জীবনসংগ্রামই শুরু হত না। ভাঙা সাইকেলটার কথাও মনে হয়, বিকেল হলেই সাইকেলে পাকা সড়ক ধরে কত দূরে যে উধাও হয়ে যেতাম। তখন শুধু স্বপ্ন, স্বপ্ন নিয়ে ঘুরছি—আরও বন্ধুবান্ধব জুটে গেল, আমরা সবাই মিলে একটা কাগজও বের করলাম, রায়বাহাদুরের নাতনি মৃন্ময়ীও জুটে গেল।

আড্ডায় যা হয়, কথা শেষ হতে চায় না। রাত বাড়ে। আকাশে নক্ষত্র ফুটে থাকে। গাছপালা অন্ধকারে কেমন নিথর। সোজা পাকা সড়ক চলে গেছে লালাবাগের দিকে। রেলগুমটি পার হলে দু-দিকে দুটো সড়ক। কারবালা দিয়ে গেলে বাড়ির রাস্তা সংক্ষিপ্ত হয়। খুবই বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে কবরখানা পার হয়ে রাস্তাটা আমাদের বাড়ির দিকে চলে গেছে। দিনের আলোয় সাহস পেলেও, রাতে ওই রাস্তা ধরে একা বাড়ি ফিরতে ভয় হয়। বাদশাহি সড়ক ধরেও যাওয়া যায়, তবে অসুবিধা, পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্পের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, ঢুকলেই সিপাই হল্ট বলে চিৎকার করবেই। তখন বলতে হয়, আমি পিলুর দাদা। ব্যস, ওই যে কথা, পিলুর দাদা, এতেই হয়ে যায়। পিলুর খ্যাতি সর্বত্র। পিলু-ধিলুরা তখন বড়ো হয়ে উঠছে।

তারপরই ট্রেনিং ক্যাম্পের আর্মারি। আমারি পার হলে মাঠ। মাঠে কাঁটাতারের বেড়া। মাঠে নামলেই আমাদের পাড়াটা চোখে পড়ে। বেড়ার গেট পার হলে দেখতে পাই লক্ষ

জ্বলছে, ঘরে ঘরে। অন্ধকার রাতে এগোনো যে কত কঠিন— গাছপালার ছায়ায় নিজেকে পর্যন্ত দেখা যায় না—তবু পথটা এত চেনা যে যেন জন্মজন্মান্তরের রাস্তা, কখনোই ভুল হতে পারে না— কারণ বাড়ি ঢুকলেই যে বাবা মা ভাই বোনেরা উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে, বুঝি। কুকুর বিড়াল কিংবা মানুষের গায়ে না পড়ি এজন্য অনবরত ক্রিং ক্রিং বেল বাজাই– যারা দূরে কাছে আছ, সরে যাও। বাবা-মা এমনকী পিলু দূর থেকেই টের পায় তার কলেজে পড়া দাদাটি ফিরছে। আমাদের ফেলে আসা দেশ, কিংবা জন্মভূমির জন্য কারও আর তেমন কোনো মায়া মমতা নেই। যেন এ-দেশে চলে এসে আত্মরক্ষা করা গেছে। মান মর্যাদা আর নষ্ট হবার ভয় নেই। মনেই হয় না আমরা ছিন্নমূল। বরং এই যেন আমাদের দ্বিতীয় জন্মভূমি। সুযোগ এবং সময় পেলেই, ছোট্ট জন্মভূমিতে বাবা, আমি শুধু গাছ লাগাই, আম জাম জামরুল কাঁঠাল লিচু এবং একটি বাতাবি লেবুর গাছও লাগানো হয়ে গেছে। গাছের সঙ্গে মানুষের যে কত নাড়ির টান বাবাকে দেখলে বুঝি। বাড়ির গাছপালার ভিতর দিয়ে সাইকেলে চেপে উধাও হওয়ার আনন্দও আলাদা। আর কী করে যে এই বাড়িঘরের সঙ্গে বাবার মতো আমিও এক গভীর মায়ায় জড়িয়ে গেছি। তারপর যা হয় মুখ বাড়ে, মানুষ বাড়ে, দায়িত্ব বাড়ে—বাবার সংসার, আমার নিজের সংসার, কত দায়িত্ব, বোনেদের বিয়ে, ভাইয়েরা কেউ পড়াশোনায় মন দিতে পারল না, পিলু মিলিটারিতে চলে গেল, বিয়ে করে যাবার সংসার থেকে আলাদাও হয়ে গেল, ধিলুর মোড়ের মাথায় দোকান। দোকান জমে উঠতেই সেও ভিন্ন হয়ে গেল। ধিলুর বউয়ের অভিযোগ আমি যে বাবার মাসোহারা পাঠাই, তাতে সব খরচ নির্বাহ হয় না।

২.

বাড়িটা আর বাড়ি থাকল না। দাদা দেশভাগের আগেই রেলে কাজ নিয়ে সুদুরে হারিয়ে গেল, সেখানে সে ঘরবাড়িও বানিয়েছে। বছরে দু-বছরে আসে এই পর্যন্ত।

তার কথায় বুঝি তারও অভাবের অন্ত নেই, পর পর সন্তান ধারণ করে বউদিও জেরবার, এবং একবার বাড়ি গিয়ে জানতে পারি সে তার বড়ো মেয়েটিকে বাড়িতেই রেখে গেছে।

বাবা বললেন, কী আর করা!

বাবা যে খুব অদৃষ্টবাদী এবং ধর্মভীরু মানুষ। জীবন একভাবে না একভাবে চলে যায়। এত ভেবে কী হবে!

তত দিনে আমারও কলকাতায় থাকার একটা আস্তানা হয়েছে। কিন্তু মা বাবা ভাই বোনের টানে, এবং সেই গাছপালা—যা প্রায় তিন বিঘা জুড়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল, তারা প্রায় বলতে গেলে মহাবৃক্ষ হয়ে উঠেছে—ডালপালা মেলে দিয়েছে —বড়োঘর, রান্নাঘর, ঠাকুরঘরও হয়ে গেছে এবং শহর জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে, প্রায়ই মা বাবার কাছে ছুটে যাই। মাটির আটচালা ঘরটির একটি তক্তপোশে বাবার বিছানা হয়, আমারও হয়, পাশের তক্তপোশে আমার মা এবং ভাইঝি শোয়, আমায় ছেলেরা কিংবা স্ত্রী গেলেও কোনো রকমে সেই ঘরটাতেই থাকি। ধিলু বাড়ির সামনের দিকটায় মাটির ঘর তুলে সে তার আলাদা সংসার করে নিয়েছে। বাড়ি গেলে বাবাই একবার বললেন, ধিলুর দোকান ধারদেনায় বসে গেছে। তুই যদি পারিস মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাস।

মা দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাঁরও এক কথা। তুই না দেখলে, কে দেখবে। এমন অবস্থা ধিলুর, দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। তুই যা টাকা পাঠাস আমাদেরই হয় না, তার উপর ধিলুর বাড়তি মুখের অন্ন জোটানো তো বাবার পক্ষে সম্ভব! ধিলুকে কত বললাম, তোকে চিঠি লিখতে, সে কিছুতেই রাজি না। বড়ো বিবেচক, দাদা কত দিক সামলাবে। বরং তোমরা বললে দাদা গুরুত্ব দেবে।

কী আর বলি, দেখি বলে চুপ করে গেলাম। সেই কবে কলেজের চাকরি নিয়ে প্রথম বাড়ি ছেড়ে কাটোয়ায় যাই। তখন থেকেই ধিলু আমার কাছে। সে স্কুলে যায়, আমার স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী একটা স্কুলের। সে-ই সকালে কাজের ফাঁকে ধিলুকে পড়ায়। কিন্তু তার পড়ায় মন বসে না। সুযোগ পেলেই, পড়া ছেড়ে উঠে যায়, স্টেশনে গিয়ে বসে থাকে—বাড়ির জন্য মন খারাপ হলেই, তাকে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। স্কুল কামাই হয়। স্কুলে না গেলে পড়ায় যে ক্ষতি হয়, কিছুতেই সে তা বোঝে না।

এক সকালে বাবার চিঠি নিয়ে বোনও হাজির। আমার কাছে না থাকলে সে পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না। তার বউদি স্কুলে পড়ায়। এই ভরসাতেই বাবা ভেবেছেন, বউমা সাহায্য করলে বিনি ঠিক পাশ করে যাবে।

পাশ আর করে!

পড়তে বসে, তবে মন অন্যমনস্ক। পড়া ছাড়া আর সব কাজই তার প্রিয়। ধিলুর সঙ্গে বিনি একদণ্ড বনে না। অথচ বাড়ি গেলে দুই ভাইবোনেই বউদিটি যে তার ভালো না, কারণ দাদাকে গ্লাস ভরতি দুধ দেয়, তাদের গ্লাস ভরতি দুধ দেয় না, বউদির খুবই দেড়

নজরে স্বভাব, এই সব অভিযোগে মা ক্ষিপ্ত হন, তাঁর এক কথা, তুই পেটে ধরেছিস, না আমি ধরেছি। তোর উপার্জনে খায়, না আমার পুত্রের উপার্জনে খায়। এই সব নিন্দামন্দ কানে উঠতেও দেরি হয় না। স্ত্রী মাঝে মাঝে এই নিয়ে কান্নাকাটিও করতেন। সে যাইহোক, কাটোয়া থেকে সরকারি কলেজে চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে আসার আগে জেলা বোর্ডের বড়োবাবু ধ্রুবকে ধরে আমার স্ত্রী একটি মাদার টিচার ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দেয় বিনিকে। আর কলকাতার স্কুলে ধিলুকে যে ভর্তি করানো কঠিন, বরং তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। সেখানে কলোনির হাইস্কুলে যদি ভর্তি করে দেওয়া যায়।

আমি নিজেই বাড়ি গেলাম।

বাবা।

বলো। আমি তো কলকাতা চলে যাচ্ছি। আপনার বউমার ডেপুটেশনে কাজ, সেও চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। কলকাতার স্কুলে ভর্তি করানো খুব টাফ ব্যাপার। ওকে কলোনির হাইস্কুলে ভর্তি করে দিন। বাড়ি থেকে পড়ুক। আর একটা তো বছর দেখি তারপর কী করা যায়।

আর, একটা বছর!

বাবার চিঠি নিয়ে ধিলু আমার বাসায় হাজির।

বাবা লিখেছেন, ধিলু আর পড়তে চায় না। সে তোমার কাছে চলে যাচ্ছে। যে কোনো একটা কাজ তাকে তুমি জুটিয়ে দিও। কী করি! বাধ্য হয়ে আমার এক ছাত্রের বাবাকে ধরে ধিলুকে কারাখানায় ঢুকিয়ে দিই। এই সব স্মৃতি আমাকে বিষণ্ণ করে দেয়। ধিলুর

শেষে এই পরিণতি! বড় দুশ্চিন্তা আমার। তার মারামারির স্বভাব প্রকট, মাথা গরম, একবার স্কুলেও সে তার এক সহপাঠীর মাথা ফাটিয়ে দিয়ে বাড়িতে পালিয়েছিল। স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী, আমি কলেজে পড়াই, কাটোয়ায় আমাদের বিশেষ পরিচিতির দরুনই বিষয়টি বেশি দূর গড়ায়নি। কারখানায়ও সে মারপিট করে চাকরিটা শেষ পর্যন্ত খুইয়েছে।

তখন সে আমার বাসায় থেকে কারখানায় কাজ করত। ধিলু কাজ পেয়েছে শুনেই, মা এক সকালে হাজির আমার কলকাতায় বাসায়।

আমি যে জন্যে এলাম— মা বললেন।

বিশেষ জরুরি কাজেই এসেছেন মা। স্ত্রী নীরা মাকে ভালোই জানে। সে ভয়ে ভয়ে প্রণাম সেরে বলল, আপনি হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন মা। আপনার ছেলে আসুক। আমার দুই পুত্র তাদের ঠাম্মাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসিয়ে দিয়েছে। তারাও জানে ঠাম্মা তাদের মাকে পছন্দ করে না। মা বাবাকে অন্য গ্রহে

তুলে আনায় ঠাম্মার যে ক্ষোভ আছে তাও তারা বোঝে

শোনো বউমা, ধিলু কোথায়?

কাজে গেছে। কারাখানায় ওর শিফট ডিউটি।

বিলু!

আপনার ছেলে বাজারে গেছে। আসছে।

আমি বসব না বউমা। মরনির ছেলের বিয়ে, বিয়ে বলে কথা, না এসেও পারা যায় না। সংসার ফেলে আসা সোজা কথা না, এলাম প্রাণের দায়ে–

আমি দরজা খুলে ঢুকতেই কানে এল কথাটা—বাজারের থলে নামিয়ে বসার ঘরে ঢুকে প্রণাম সেরে বললাম, প্রাণের দায়! প্রাণের দায় কেন মা!

হ্যাঁরে বাবা। তোর পলতার মরনিমামির ছেলে জনার্দনের বিয়ে। যখন এতটা দূরে এলামই, তোকে, নাতি দুটোকে না দেখে যাই কী করে। প্রাণ কাঁদে।

কে তোমাকে দিয়ে গেল!

নরহরি।

অর্থাৎ আমার মেলোমশাই, বললাম, তিনি এলেন না।

আসে কী করে! বিয়ে বলে কথা, এদিকটার আত্মীয়স্বজনদের বিয়ের চিঠি দিয়ে আসবে। তার সঙ্গেই ফিরব।

প্রাণের দায়টা কী তোমার! এসেই যাওয়ার কী হল।

তুই কি বাবা মানুষ আছিস!

বুঝলাম হয়ে গেল। সবটাই নীরা উপলক্ষ।

নিজের ভাই বলে কথা! সে থাকে তোর কাছে, তার কাছ থেকে, কোন মুখে খোরাকির টাকা নিস—

ও তো কোনো টাকা দেয় না মা!

দেবে কোত্থেকে, কটা টাকা মাইনে, তোকে দিলে ওর বউকে কী পাঠাবে! ওর বউয়ের যা চোপা, ঠেস দিয়ে কথা—নিজের ভাই, থাকে খায় সে জন্য কেউ টাকা নেয়! কী মুখ বউটার! তোকেও ঠেস দিয়ে কথা বলে। একজনের নামের চোটে গগন ফাটে, আর তারই ভাই উবু হয়ে ঘাস কাটে। আরে তোর এ-কথা সাজে, বিপদে আপদে সেই তো দেখে!

বললাম, মা ধিলু আমাকে কানাকড়িও দেয় না। খোরাকির টাকার কথা আসে কী করে!

কী জানি বাবা তোরাই জানিস।

বছর দশেক ছিল ধিলু আমার বাসায়। তারপর ফের বাড়িতে। কোম্পানির প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং সঞ্চিত টাকা নিয়ে গিয়ে ফের মোরের মাথায় দোকান, এবং বাড়ি ছেড়ে সে যে থাকতে পারেনি—কাজে কামাই করারও স্বভাব ছিল তার। বাড়ি গেলে আর ফিরতে চাইত না। কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার এটাও বোধহয় একটা কারণ। ধিলুকে নিয়ে আমার শুধু দুশ্চিন্তা বাড়ে।

৩.

সে বারে বাড়ি গিয়ে দেখি, ধিলুর ঘরটা ফাঁকা।

বাবা বুঝতে পেরে বললেন, তাড়িয়েছি। অত্যাচারের শেষ নেই। সে আমার ত্যাজ্যপুত্র।

কী বলছেন!

তোমার ভাইঝিকে ধিলুর বউ চর মেরেছে। ধিলু বারান্দার টালি টেনে ছুঁড়ে ফেলেছে উঠোনে। তোমাকে জানাইনি। পিলু ছুটে না এলে ধিলুর বউ তোমার ভাইঝিকে মেরেই ফেলত। চুল ধরে টানতে টানতে উঠোনে আছড়ে ফেলেছে। মানিক ছুটে এসে লাঠি নিয়ে তাড়া না করলে আমাদেরও মেরেই ফেলত। বাড়িটা দিন দিন শেষে কী হয়ে উঠল।

আমার মা জেদি, একগুঁয়ে। বুঝি দোষ সবটাই ধিলুর বউয়ের নয়। ভাইঝিও রগচটা। সে যাহোক, বললাম ওরা কোথায়।

দীনবন্ধুর বাড়িতে বাসা ভাড়া করে আছে। এটা খারাপ দেখায় বাবা। বাড়ি ঘর থাকতে বাসা ভাড়া করবে শত হলেও সে আপনার পুত্র।

পুত্র না মূত্র। তুমি যা পাঠাও ওই সম্বল আমার। একটা পয়সা দেয়! দিতে পারে, দেবে না। কুপুত্র থাকার চেয়ে না থাকা ভালো। আর প্রতারণা, তোমাকে সাতকাহন করে যে অভাবের কথা লেখে সব বানানো। সুদের ব্যবসা করছে সে।

কথায় কথা বাড়ে। মা বললেন, থাকবি তো! রুমির একটা সম্বন্ধের কথা হচ্ছে। সবই ঠিক, কেবল বলেছি তুই না এলে কিছু হবে না। তুই না দেখলে কিছু হবে না। দেনা পাওনা নিয়ে সেই কথা বলবে।

আমি বললাম, দাদা কী বলছে! দাদা দেখুক।

বাবা বললেন, সে দেখবে না। তার দায় নেই জানিয়ে গেছে। আমার কাছে

বড়ো হয়েছে, আমার দায়। তার নিত্য অভাব, জানিয়েছে, বিয়ে দেবে কোথেকে। ঘাড়ের উপর তার আরও তিনটি মেয়ে দাদার দোষও দেওয়া যায় না। পুত্র দুটির তার অপুষ্টি কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, বুদ্ধি-বিবেচনার খুব অভাব। কিছুটা মানসিক প্রতিবন্ধীও বলা যায়। রেলের চতুর্থ শ্রেণির একজন কর্মীর পক্ষে এতগুলো মানুষের ভরণপোষণই কঠিন।

মা বললেন, কীরে কদিন থাকবি তো! গলায় বিষধর সর্প নিয়ে ঘুরছি। তুই ছাড়া কে উদ্ধার করবে—তুই দেখে যা। দাবিদাওয়া বলতে নগদ পঞ্চাশ হাজার চায়, আর কিছু চায় না। আর বিয়ের খরচ।

আমি কী যে বলি! নগদ দেওয়া যে অপরাধ, যে দেয় সেও অপরাধী। তারপর এত টাকা পাব কোথায়! সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে মা। মা ফের বললেন, সাদুল্লা আমগাছটা বিক্রি করলে হাজার তিনেক টাকা পাওয়া যাবে। যদি বলিস, গাছটা না হয় বিক্রি করে দিবি। বিয়ের খরচ মিটে যাবে।

বাবা খেপে গেলেন, শোনো ঠাকরুণ, গাছ আমার প্রাণ। গাছগুলোর দিকে তোমাদের নজর পড়েছে দেখছি। এত বড়ো বড়ো গাছ বাড়ির চারপাশে তোমার সহ্য হচ্ছে না!

বিকেলে আমার বোন বিনিও হাজির। তার বিয়ে কলোনিতেই হয়েছে। সে কলোনির প্রাথমিক স্কুলে মাস্টারিও করে। সপ্তাহে দু-সপ্তাহে একবার মাকে রুমিকে দেখে যায়-রুমিকে সে মেয়ের মতোই ভালোবাসে। কারণ মাকে যখন দাদা রেখে যান তারই উৎসাহ ছিল বেশি। আমি রাজি ছিলাম না।

ভগ্নিপতিও কিছুক্ষণ পরেই হাজির। কথাবার্তায় খুবই ভদ্র এই ভগ্নিপতি, প্রণাম সেরে বলল, কবে এলেন দাদা। ছেলেটিকে আমার পছন্দ। বাজারে স্টেনলেস স্টিলের বাসনকোসনের দোকান আছে। দোকানটা সে বড়ো করতে চায়। এই জন্যই নগদ টাকা তার দরকার।

কী যে বলি! তবু বললাম, সবাই মিলে দিলে ত হয়েই যায়। তবে এত টাকা!

আর কার দেবার সামর্থ্য আছে বলুন! থাকলেও মুখ শুকিয়ে রাখার স্বভাব। কার কাছে চাইবেন বলুন। ইচ্ছা হল বলি বিনিও দিতে পারে। তুমিও পার। সবাই মিলে দিলে আমার ভার লাঘব হয়। গাছও কাটতে হয় না। যাই হোক বিয়ে আর হয়নি। ছেলের কী খুঁত পাওয়া গেছে।

রাতের দিকে বারান্দায় বসে আছি। বাড়ি এলে যে আমরা পরমায়ু বাড়ে—এত সব গাছপালার মধ্যে বসে থাকার আনন্দই আলাদা।-দেখি অন্ধকারে উঠোন অতিক্রম করে কে বারান্দায় উঠে আসছে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া। ধিলু! তার ছেলে দুটি এবং মেয়েটিও হাজির। ওরা প্রণাম করে বলল, জেঠু তুমি কিন্তু আমাদের বাসায় যাবে। মা রাতে তোমাকে খেতে বলেছে।

সবারই কুশল নিতে হয়।

তুই কোন ক্লাশে পড়িস মেঘা?

ক্লাশ ফোরে পড়ি।

সিধু তুই?

আমি পড়ি না জেঠু।

তখনই মা বললেন, ও তো ব্যবসা করবে বলছে। একটা সাইকেল না হলে চলছে না। আমাকে ধরেছে, ঠাম্মা তুমি জেঠুকে বলো, আমাকে একটা সাইকেল কিনে দেয়।

ধিলু বাঁশে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। কোনো কথা বলছে না। সে যে ভিতরে ভিতরে ফুঁসছে বুঝি, তার এই ক্রোধ যে বাবা বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ায় তাও বুঝি— বারান্দার এক কোনায় হারিকেনটা রাখা, তার আলোতে সবার মুখই আবছা দেখা যায়, রুমি ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, কাকা সবারই চা হচ্ছে, আপনাকে দেয়?

দে। ধিলুকে বললাম, তুই এত অমানুষ ধিলু, বারান্দার টালি সব ভেঙে ফেললি, তোর স্ত্রী রুমিকে ধরে মারধর করল ছেলেটার পড়া বন্ধ করে দিলি, এই সে দিন হল, ব্যবসার ও কী বোঝে!

সহসা ধিলু আগুনের মতো জ্বলে উঠল। আমি অমানুষ—তোরা সব মানুষ। তুই আমাকে টাকা পাঠাতিস, মা-র সহ্য হল না। বউদিকে লাগাল। তুই টাকা বন্ধ করে দিলি।

তোর দোকান তো ভালোই চলছে।

মিছে কথা। ঈর্ষা, এই দোকান থেকে কী হয় বুঝিস না, ধার দেনায় ডুবে গেছি। বাসা ভাড়া করে থাকতে হয়, এখন সব রুমি, তুই জানিস দাদা, দিদি মা মিলে তোর টাকা থেকে রুমিকে পাসবই করে দিয়েছে। তোকে চাপ দিয়ে, তুই খাস না-খাস বছরের পর

বছর টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে নিচ্ছে, দিদিই দেখবি রুমির বিয়ে দেবে না। ওর মেয়েকে কে পাহারা দেবে, সকাল হলেই রুমি দিদির বাড়ি চলে যায়—তার মেয়ের দেখাশোনা করে, বাড়িতে কতক্ষণ থাকে!

এসব কথা আমার শুনতে ভালো লাগে না, বললাম ঠিক আছে, বাবাকে বললাম, আপনি সামনের দিকে ওকে দুকাঠা জমি দিন, ধিলু বাড়ি করে থাকুক। বাড়ির ছেলে পাড়াতে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকবে, দেখতেও খারাপ লাগে।

বাবা আর কী করেন? বাড়ির দায়-অদায় সব যে সামলায় তার কথা ফেলাও যায় না, তিনি বললেন, আমার উঠোনে সে থাকতে পারবে না। জায়গার তো অভাব নেই, রাস্তার দিকে জায়গা দে।

সেই মতো ধিলু জমিটার এক কোনায় বাড়িঘর করে আছে। বছরে দু-চারবার কখনো আরও বেশি বাড়ি যাওয়াই আমার স্বভাব। মাটির টানে হতে পারে, মা বাবা ভাই বোনের টানে হতে পারে, গেলেই কেমন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। অথবা সেই গাছপালা বৃক্ষ, কারণ কখনো যে বাড়িটাকে তপোবনের মতো মনে হয়, শহরের কোলাহল থেকে এই সব বৃক্ষসমূহের নির্জনতায় ঢুকে গেলে তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে। বাবার লাগানো গাছ, আমার লাগানো গাছ পঁচিশ-ত্রিশ বছরে যে-সব মহাবৃক্ষ হয়ে গেল, তার নীচে চেয়ার পেতে দিলে গাছের সঙ্গে আমার কথা হয়।

বাবাও সারা দিন এ-গাছ সে-গাছের গোড়া খুঁড়ে মাটি আলগা করে দেন, এতে গাছের প্রাণশক্তি বাড়ে। সারা দিন বাবাও গাছের সঙ্গে কথা বলেন।

সে যাহোক, সে বারে বাড়ি গিয়ে টের পাই, প্রকৃতই বাবার অনেক বয়েস হয়ে গেছে। বাবা বারান্দায় জলচকিতে বসে আছেন। বর্ষাকাল, বাবার শরীর কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

আমার জরুরি কাজ, পরদিনই ফিরতে হবে। পিলুকে ডেকে পাঠালাম। সে কয়েকটা জমি পার হয়ে আলাদা জমি কিনে পাকা বাড়ি করে আছে।

বাবার শরীর কিন্তু ভালো না পিলু।

সে তো জানি দাদা, আমি একা কী করব?

কালু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যা, না হয় কল দে। বাবার রক্ত পরীক্ষা করা দরকার। ধিলুকে ডেকে বললাম, বাবার কিন্তু শরীর ভালো না।

ধিলুর সোজা কথা, আমার পক্ষে সম্ভব না কিছু করা। অগত্যা আর কী করা, নিজেই ছোটাছুটি করে বাবাকে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করে আসার সময় বিনিকে খবরটা দিয়ে এলাম। সাত দিনের মাথায় বিনির টেলিগ্রাম। আমাদের বাবা আর নেই।

৪.

নামের চোটে গগন ফাটে এমন সব কথা এমনিতেই পাড়াগাঁয়ে চাউর হতে সময় লাগে না। মান এবং বংশের মর্যাদা রক্ষার্থে, সব ভাইরাই বসল। দাদাও বাড়িতে চলে এসেছেন।

বললাম, দাদা, বাবার শেষ কাজ। আমরা সবাই তঁরা আত্মার সদগতির অংশীদার। তোমরা কে কী দিতে পারবে, বললে ভালো হয়।

দাদার দিকে তাকালাম, আমি ভাই হাজার টাকার বেশি দিতে পারব না।

পিলু—

দাদা আমার অবস্থা তো বুঝিস?

ধিলু—

আমরা ক্ষমতা কোথায়! মাঝে মাঝে কিছু দিস বলে এখনো দুবেলা খেতে পাই।

অগত্যা ভগ্নীপতিকে ডেকে পাঠালাম। এবং পুরোহিত ডেকে ফর্দ তৈরি হল।

আমাদের আত্মীয়স্বজন মেলা। জেঠা কাকারাও আছেন, বংশটি বড়ো, কারণ বাবা জেঠারা পাঁচ ভাই-দুই বোনও আছে, তা ছাড়া কলোনির কাজে কর্মে যারা আমাদের নিমন্ত্রণ করে তাদেরও বলা দরকার। এ ছাড়া পিলু ধিলুর শ্বশুরবাড়ির মানুষজন, কাজেই তালিকাটিতে নামের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। বাবার কাজে কোনো কার্পণ্য থাকুক আমি চাই না। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ সহ দান-ধ্যানেরও ব্যবস্থা থাকল। বলতে গেলে ঘটা করেই কাজ সারা হল।

মৎস্যমুখ হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে কলকাতার ফিরব। বড়ো পুত্রের বারো ক্লাসের রেজাল্ট বের হবে পরদিনই বড়ো মাটির ঘরটায় তক্তপোশে বসে আছি। মা কেমন ব্যাজার মুখ করে বলল, আমাকে আলাদা ক-টা টাকা দিয়ে যাস বাবা। স্টোভ না

কিনলে আমার রান্না হবে কীসে। মন আমার আরও খারাপ হয়ে গেল। বাড়ির টানে বাড়ি ফিরব ঠিক, তবে বারন্দার চেয়ারে বাবা বসে তামাক খাচ্ছেন, এই দৃশ্যটি আর চোখে পড়বে না। কেন যে চোখে জল এসে গেল। বড় বিষণ্ণ হয়ে গেলাম—বাইরে বের হয়ে অবাক, গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। কেমন চার–পাশ এবং গাছপালা সহ সমস্ত প্রাণীজগৎ যেন স্তব্ধ হয়ে আছে।

আসলে আমি বিষণ্ণতার শিকার এবং কোথাও যেন প্রাণের লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছি না।

পিলুকে ডেকে পাঠালাম।

ধিলুকেও।

শোনো, আমার মা থাকল, রুমি থাকল। এদের তোমরা দেখো। অযথা ঝগড়া করবে না। অসুবিধে হলে আমাকে জানাবে। এই যে গাছপালা বাবা লাগিয়ে গেছেন, এখন সব মহাবৃক্ষ, আম, জাম নারকেল গাছ কী নেই। নারকেল গাছ দুটো এই সে দিন বাবা লাগালেন। পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে বাবা এই গাছগুলির সঙ্গেই কথা বলেছেন, তোমাদের আচরণে তিনি তোমাদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না, মা চোপা করলে, বাবার এককথা, এই যে গাছ লাগিয়ে গেলাম—এরাই তোমাকে দেখবে। পুত্র না মূত্র বলে তিনি আমাদের অবজ্ঞাও করতেন। যাহোক, তোমরা গাছের কিছু ধরবে না। জমিজমা যেটুকু আছে, সবই মা ভোগ করবেন।

যেহেতু ধিলু পিলুর সুবিধা-অসুবিধায় আমি আছি, তারা সুবোধ বালকের মতো বলল, তুই যা বলবি তাই হবে।

ধিলু বলল, জমি ভাগ হবে না?

না। মা যদ্দিন আছেন, এ-বাড়ির, মাসির বাড়ির কোনো জমিই ভাগ হবে না। মা যত দিন বেঁচে আছেন, তাঁর ইচ্ছে মতো জমি ভোগ করবেন। ফলপাকুড় যা তিনি তোমাদের হাতে ধরে দেবেন তাই নেবে।

তুই যা বলবি, তাই হবে।

সেই এক কথা–একেবারে একান্ত বশংবদ। ঘাড় তুলতে বললে তুলবে, ঘাড় নামাতে বললে নামাবে।

মাকে নিয়ে মুশকিল হচ্ছে, তিনি কারও ওপর প্রীত থাকলে, দু-হাত উজার করে তাকে সব দিয়ে দিতেন। রুমি আর ধিলুর বউ দুজনেরই আচরণ সাপ আর নেউলের মতো। গাছের আম জাম জামরুল, প্রতিবেশীদের ডেকে দেবেন, কিন্তু ধিলুর বউকে দেবেন না। তার ছেলেমেয়েরা গাছতলায় ঘুরে বেড়ালেও রক্ষা থাকত না।—গাছতলায় ক্যারে।

অবশ্য আমার মা কখন কার পক্ষ নেবে বলাও মুশকিল মা কীভাবে যে কার অনুগত হয়ে যান তাও বোঝা যায় না। ধিলু এক সকালে কলকাতার বাসায় এসে হাজির। মা তাকে চিঠি লিখে দিয়েছেন, আমাকে দিতে। চিঠিতে দেখি গাছ বিক্রির কথা আছে। ধিলুব খুব অভাব। আতপ চাল রাখার অজুহাতে পুলিশ তার দোকান সিজ করে দিয়েছে। তার ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। থানা, পুলিশ, আদালত, সামলাতে অনেক টাকার দরকার।

লাইসেন্স না থাকলে দোকানে চাল রাখা যায় না। ধিলুর দোকান থেকে প্রায় আট কুইন্টাল চাল পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে। দোকানও বন্ধ করে দিয়ে গেছে, এখন বাড়ির বাবার লাগানো গাছই একমাত্র তাকে রক্ষা করতে পারে। গাছই ভরসা।

মামলা কত দিন চলবে উকিলও বলতে পারল না পুলিশে ছুলে আঠারো ঘা বুঝি, এই খরচ চালানো আমার পক্ষেও কঠিন, বললাম, তোরা যা ভালো বুঝিস করবি।

গাছ কাটা শুরু হয়ে গেল। আমারও ধিলুর জন্য দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকল। আমিই বা কতকাল টানব।

ধিলু দুটো বিশাল আমগাছ বিক্রি করে আপাতত শান্ত আছে। মাঝে মাঝে সে আমার বাসায় এসে বাড়ির খবর জানিয়ে যায়, হেমন্ত উকিলের ফিজ বাবদ টাকাও নিয়ে যায়—আর আমার এত অনুগত যে সে তার লেবুগাছ থেকে কিছু কাগজি লেবু নিয়ে এলেই নীরা খুশি, বাড়ির গাছের লেবু, এতেই নীরা ধন্য।

ধিলু এলেই এক কথা, জানিস দাদা মা কাঁঠাল গাছ দুটো বিক্রি করে দিয়েছে, দিদির পরামর্শে এ সব করে মা, সব টাকা রুমির নামে পাশবুকে রাখছে। আমার মেয়েটাও বড়ো হচ্ছে—আমি যাব কার কাছে! এভাবে কখনো মা, কখনো ধিলু, কখনো পিলু, আপদে বিপদে গাছই যে ভরসা—গাছ কাটতে অনুমতি না দিলে দায়টা যে আমার ঘাড়ে চাপবে বুঝি। নীরাও বোঝে, ওর এক কথা, যা খুশি করুক।

তবে যা খুশি করলেই তো হয় না। বাড়ি যাই, বাবার ঘরটায় থাকি, গাছপালা কাটা হয়ে গেলে কী যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় কেউ বোঝেই না। অজুহাতেরও শেষ নেই। ধিলু বড়ো

রাস্তার ধারে বাড়ির সামনের দিকটার আছে—সে নতুন করে গাছ লাগাচ্ছে সামনের দিকটায়। মা বলল, তুই ধিলুকে গাছ লাগাতে দিস না। আমিও বুঝি, জমি দখলের চেষ্টা, বাধ্য হয়ে বললাম, জমি বন্টন নামা হয়নি, গাছ লাগাচ্ছিস তুই!

ধিলুর একেবারে দরাজ প্রাণ, জমি খালি আছে, লাগিয়ে দিচ্ছি। বন্টননামা হলে যার যার জায়গা সেই পাবে। গাছ তো কাটলে বাধা দিতে যাবে না।

অকাট্য যুক্তি। আমার বাবাও গাছ লাগাতে ভালোবাসতেন। ধিলুও গাছ লাগাতে ভালোবাসে। আমি শুধু বললাম, তুই লাগাচ্ছিস ভালো। পরে এই নিয়ে যেন ঝামেলা না হয়।

না না। তুই যা বলবি তাই হবে।

মামলা করতে গিয়েই আদালতের উকিল মুহুরিদের সঙ্গে চেনা জানা হয়ে গেল ধিলুর। সে আদালত চত্বরে ফলের কারবারিও হয়ে গেল। যে দিনের যে ফল। গরমে ডাব, শীতে আঙুর, আপেল বেদানা নেসপাতিও বিক্রি করে। আম, লিচু, কাঁঠালের সময়, লিচু বিক্রি করে, আম বিক্রি করে। বাড়ির গাছের একটা ফল থাকে না। মা শাপ-শাপান্ত করে, তোর সর্বনাশ হবে রে, তুই নির্বংশ হয়ে যাবি। রাতে আমার গাছ কে ফাঁকা করে দেয় বুঝি না! মা গেলেই নালিশ দেবে, তুই অরে কিছু বলবি না। আসলে ধিলু পিলু আমার পায়ে পায়ে বড়ো হয়েছে, ধিলুর অভাব সে দূর না করতে পারলে আমার সাধ্য কী দূর করি! ছ্যাঁচড়ামি করে যে পেট ভরে না, কলকাতার বাসায় এলে তাও টের পাই। চোখ মুখ শুকনো, যেমন সত্যি চোরের মতো চেহারা হয়ে গেছে—বাসায় ঢুকেই নীচের ঘরের

খাটে লম্বা হয়ে যাবে, কথা বলবে না, স্নান করতে যাবে না, জোর করে যেন তাকে স্নানে পাঠানো হয়, খেতে বসানো হয়, রান্নার মেয়েটা পিছু লেগে থাকে। বাড়িতে যে তার স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হয়, ঠিক মতো টাকা না পাঠালে আমাকে আত্মহত্যারও হুমকি দেয়। ধিলু আমার বাড়িতে এসে যদি কিছু করে বসে, এই এক আতঙ্কও কাজ করে। স্ত্রীর স্কুল, আমার অফিস, বউমাদেরও কলেজ না হয় হাসপাতলে ডিউটি, কাজের লোকরাই সব দেখে, রান্নার মেয়ে প্রভারই দায়—সে বার বার তাগাদা দেবে, যান কাকা, স্নানে যান, খাবেন কখন, খেতে বসুন, এবং সে খায় আবার শুয়ে থাকে, বাড়ি ফিরলে দেখি নীচের ঘরের খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। আমি জানি যে অভিপ্রায়ে এসেছে, তা না মেটা পর্যন্ত স্বাভাবিক হবে না।

কীরে কী খবর?

আর খবর! মেঘার কোনও খোঁজ নাই। মেঘা তার বড়ো পুত্র।

বলিস কী!

কী যে করি! ওর মাসির বাড়ি যাব, যদি সেখানে যায়। এবং আরও নানা অছিলায় আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যখন টাকাটি তার হস্তগত হয়, তখন আর তাকে দেখে কে! দ্রুত স্নান টান সেরে, তখন তার খাবারও সময় থাকে না, রাস্তায় খেয়ে নেবে বলে, এবং বের হয়।

মায়ের মৃত্যুর জন্যও ধিলু দায়ী এমন মনে হয় আজকাল। লিচু গাছটায় এত লিচু হয়, যে দূর থেকে মনে হয় এক থোকা মেরুন রঙের ফুল হয়ে গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। লিচু চুরি

যাবে বলে, রাতে মা ঘুমায় না, বার বার উঠে গিয়ে গাছটার নীচে দাঁড়ায়। হাতে লণ্ঠন, লণ্ঠন তুলে দেখারও চেষ্টা করে। হনুমানেরও উৎপাত আছে, তবে মা আসল হনুমানের চেয়ে ধিলুকেই ভয় পায় বেশি। দুপুরে পর্যন্ত ঘুমায় না, গাছতলায় বসে থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাস, বৃষ্টি নেই হাওয়া আগুনের মতো গরম এবং যেন লু বয়, যত কষ্টই হোক মা লিচুগাছ পাহারা দেবেই। এবং এই করে গাছতলা থেকে বারান্দায় উঠে চেঁচায়, এক গ্লাস জল দে রুমি। বলে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে, রুমি জল নিয়ে এসে দেখে ঠাম্মা, কাত হয়ে পড়ে আছে। কোনো হুস নেই মার। তাঁর আর হুস ফিরেও আসেনি। মা বোধহয় বুঝেছিলেন, যে কটা টাকা পাওয়া যায় লিচু বিক্রি করে, রুমির পাশ-বুকে রেখে দেবেন। মা যে আমার রুমি-অন্ত প্রাণ। রুমির বিয়ে না হোক, তার নামে ব্যাঙ্কে অনেক টাকা জমা রাখার স্বপ্ন দেখতেন মা। সেই স্বপ্নও আমার মা-র শেষ হয়ে গেল।

তারপর যা হয় বাড়িটা আবার আত্মীয়স্বজনে ভরে যায়।

মাটির আটচালা ঘরটির তক্তপোশে শুয়ে কত কথা যে ভাবি, এই মা, আর আমরা তার এই পুত্র। কষ্ট হয়—মায়ের কাজ-কামও ঘটা করে করতে হয়, কারণ তিনি যে বিলুঠাকুরণের মা।

আটচালা টিনের ঘরটাতে গেলেই থাকি। একবার গিয়ে দেখি বড়ো তক্তপোশটা নেই।

ধিলু বলল, বড়ো তক্তপোশটা দুই ভাই ভাগ করে কেটে তাদের ঘরে তুলে নিয়ে গেছে।

কী আর বলি! তবে ছোটো তক্তপোশটা আছে। গেলে সেখানেই শুই। সে ঘরেই থাকি চাল ডাল তেল নুন এক মাসের মতো ধিলুকে কিনে দিই। সকালে ভালমন্দ বাজারও

করি। দুবেলা ধিলুর বউই রান্না করে খাওয়ায়। বাড়িতে গাছ বলতে আর বিশেষ কিছু নেই, শুধু জঙ্গল, নারকেল গাছ দুটো শুধু আছে।

নিরানব্বই সালের বন্যায় আমার প্রিয় সেই টিনের আধচালা ঘরটির খুব ক্ষতি হয়। ধিলুর ঘরটিরই বেশি ক্ষতি হবার কথা। নীচু জমিতে তার ঘর। অথচ ধিলুর ফোন পেলাম, সে জানাল, মাটির দেয়াল ফেটে একটা দিক ধসে গেছে। বড়োই ফাঁপড়ে পড়ে গেলাম, ঘরটি মেরামত না হলে বাড়িতে গিয়ে থাকার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। বাবা-মা এবং আমরা থেকেছি, সব ভাইবোনেরা এই ঘরটায় বড়ো হয়েছি। এই ঘরেই বাবার মৃত্যু হয়েছে, মাও গত হয়েছেন এই ঘরে। এ তো ঘর নয়, আমার পরমায়ুর প্রাসাদ—ইট গেঁথে পাকা করারও সুযোগ নেই কারণ মাটির ঘরের সৌন্দর্য পাকা বাড়িতে থাকে না। বাবা কিংবা মায়ের কারও ইচ্ছাই ছিল না ঘরটি পাকা হোক।

এই ঘরের মেরামত উপলক্ষেও ধিলু যথেষ্ট টাকাপয়সা নিয়ে গেছে। আশায় আছি, ঘরটি থাকার উপযুক্ত হয়ে ধিলু ফোন করে জানাবে। বাড়ির পাশেই এস টি ডি বুথ থেকে আজকাল সবাই ফোন করে থাকে। আমার বোন বিনি জানাল, দাদা তুই আর টাকা দিস না। তুইও ফতুর হয়ে যাবি।

সত্যি তো দু-তিন মাস হয়ে গেল, নিজের চোখেই একবার দেখে আসা যাক। গিয়ে দেখি ঘরটা আছে। তবে দেয়াল মেরামত হয়নি। ছোট্ট তক্তপোশটাও হাওয়া।

বললাম, মেঝেতেই থাকা যাবে। তোর দুই ছেলে তো এ ঘরে থাকে বলেছিলি।

ধিলুর মুখ করুণ।

ধিলুর বড়ো পুত্র মেঘা বলল, তুমি থাকবে। এই সে দিন একটা এত্ত বড়ো মোটা চিতি ফুলগাছটা থেকে লাফিয়ে পড়ল টিনের চালে। ভয়ে আর আমরা ঘরটায় শুই না।

ধিলু বলল, ঘরে বাড়ির সেই বাস্তু সাপটা আশ্রয় নিয়ে আছে। রাত-বিরেতে পা পড়লে–

পিলু এসে বলল, দাদা, তুই আমার বাড়ি চল। এ ঘরে থাকা ঠিক হবে না। মেঝেতে শুবি কী করে!

ঘরে ঢুকে দেখলাম, দেয়ালের দুরবস্থা। টিনের চাল একদিকে কাত হয়ে আছে।

ঘরটায় আমি থাকলে দখল-স্বত্ব থাকত। ধিলু ঠিক পরিকল্পনামাফিক আমাকে উৎখাত করছে। সব বুঝি। কিন্তু ধিলুকে দেখে আমার কষ্টই হল, সেই লুঙ্গি-পরা বাসি দাঁড়ি গালে।

ধিলু বলল দাদা তুই আমার বারান্দায় থাক। কোনো অসুবিধা হবে না। আমার বাড়িতে লাইট এসেছে। তোর অসুবিধা হবে না। ধিলুর বউ মেয়ে খুব আদর যত্নের মধ্যেই রাখল। খেতে বসলে বউমা বলল, আপনার ভাইঝির বিয়ের কী করবেন। আপনি মাথা না পাতলে আমাদের সাধ্য আছে বিয়ে দিই। নগদই আঠারো হাজার টাকা চায়— তারপর দানসামগ্রী। তা ছাড়া ধিলু বাইরে ডেকে বলল, দাদা বংশের মান সম্মান আর থাকবে না। তোর ভাইঝি এস টি ডি-র ছোকরাটার সঙ্গে পালাবার ধান্দা করছে। আমাকে রক্ষা কর দাদা।

মনে মনে ভাবলাম, এরা আমাকে কী পেয়েছে। আমি পাগল, না ভাইদের উপসারী একজন দানব। আমারও তো সংসার আছে। যদিও আমার পুত্ররা কৃতী তবু কেন যে মনে হল কোনো ছলনা আমাকে গ্রাস করছে।

ন্যাড়া আর বেলতলায় যায়!

বিনি আমাকে ফোনে জানাল, খবরদার দাদা, টাকা দিবি না। তার আগে জমি বন্টননামা করে নে। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে, ধিলু তোদের কিন্তু জমির দখল দেবে না। বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

পরদিনই চলে এলাম। আসার আগে সারা বাড়ির কোথায় কী গাছ ছিল মনে করার চেষ্টা করলাম। এক জীবনে একটা বাড়ি ছারখার হয়ে যেতে পারে, আমাদের সেই টিনের আটচালা ঘরটি না দেখলে অনুমান করাই কঠিন। রাস্তায় রিকশায় তুলে দেবার সময়ে ধিলু বলল, দাদা তুই পঁচিশ হাজার টাকা দিলেই হবে। আর তোর কাছে আমি কোনো দিন টাকা চাইব না।

কোনো কথা না বলে রওনা হয়ে রাতের দিকে বাড়ি ফিরে এলাম। অবাক, এসে দেখি ধিল আমার আগেই কীভাবে বাসায় পৌঁছে গেছে। সে আমার ছোটো পুত্রকে রাজি করিয়েও ফেলেছে। আর ছোটো পুত্রের কথা কখনোই আমি অগ্রাহ্য করি না। তবু কোথায় যেন এক প্রতারকের পাল্লায় পড়ে গেছি এমন মনে হল আমার।

মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরই, পিলুকে ধিলু শাসিয়ে গেছে, যে বাড়ি ঢুকবে দখল নিতে লাশ ফেলে দেব। আমাকেও সে ফোনে একই হুমকি দিয়েছে।

জমির দর বাড়ছে। ত্রিশ হাজার টাকা কাঠা। তিন বিঘা জমির দু-বিঘে তার, আর এক বিঘে আমরা ইচ্ছে করলে পাঁচ ভাইবোন নিতে পারি। সেই পিতার প্রকৃত অধিকারী তার দাবি। সবাই উড়ে গেছে, সেই একমাত্র এই বাড়িতে বসবাস করছে। তা ছাড়া জমি, আমার বাবার অনুমতি দখল, বলতে গেলে খাস জমি—সে, তার দুই পুত্র এবং কন্যা মিলে পাঁচ কাঠা করে কুড়ি কাঠা জমির আইনত উত্তরাধিকারী—তারা এখানে বাড়ি করে আছে। কে হঠায়!

ছোটো পুত্র শুধু বলল, একবার দেশ থেকে উচ্ছেদ, দ্বিতীয়বার পিতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ। ভালোই হল।

সারা জীবন দাদার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার চেয়ে এ যে এক আশ্চর্য মুক্তি, আমার তা কে বোঝে!